...বাংলা ... 136

তারিখ 17/7/78
পৃষ্ঠা 5 3

অন্তর্বর্তী শিক্ষানীতি প্রবর্তন প্রসঙ্গে

শিক্ষা কাঠামোর আমূল সংস্কারের আগে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের অনিবার্যতার কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ। অন্তর্বর্তীকালীন এই শিক্ষানীতির প্রধানতম লক্ষ্য হবে শিক্ষাকে দ্রুত সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলেছেন। এর একটি হলো: শিক্ষা ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। এই ব্যয় এতটা কমিয়ে আনতে হবে যাতে স্বল্পবিত্ত মানুষ এবং দরিদ্র কৃষক মজুর শ্রেণী তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হলো: শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করে তোলা। নিরক্ষরতা দূর করার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এর জন্যে দেশজোড়া একটি আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর নরনারী এই আন্দোলনের ফলে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়োজনের কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। কেননা, এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পরিপূরণ তথা গণমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের স্পষ্ট লক্ষ্যের প্রতিফলন থাকবে। এ কারণেই এতে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী আভাস দিয়েছেন, শীগগীরই এ ধরনের ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার বলতে গেলে, এখনও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে লর্ড ম্যাকোলে শিক্ষার নামে আমাদের ঘাড়ে হীনমন্যতার যে ভূত চাপিয়ে দিয়েছিলেন, এই ১৯৭৮ সালেও তার চাপে আমরা ন্যুব্জপৃষ্ঠ হয়ে আছি। ম্যাকোলে ছিলেন উপনিবেশবাদের এক পরাক্রান্ত প্রবক্তা। তিনি শিক্ষাকে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে চতুর সেই শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাবিদ তাঁর ইচ্ছা ষোল আনার চাইতেও বেশি পূরণ করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ম্যাকোলে দেড়শ বছর আগে তাঁর শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবনায় বলেছিলেন: এ দেশে এমন একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে যারা গাত্র বর্ণে এ দেশীয় হলেও চিন্তা-ভাবনা এবং মানসিকতার দিক থেকে হবে পুরোদস্তুর ইংরেজ কিংবা ইউরোপীয়। দেশীয় আলো-বাতাসে পালিত হলেও দেশের মাটির সঙ্গে এঁদের কোনো সংশ্রব থাকবে না। এরা কথা বলবে ভিন্ন ভাষায়। কল্পনা করবে পাশ্চাত্য ভাবাশ্রিত মন নিয়ে। নিজস্ব উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধিই হবে এদের একমাত্র কাম্য। সংস্কৃতির দিক থেকে এরা হবে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যমুখী। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই মডেলে একটি আলাদা সমাজ গড়ে তুলতে পারলেই এদেশে শুধু পাশ্চাত্য কৃষ্টি নয়, পাশ্চাত্য শাসনকেও দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে।

বহু যুগ আগে গতায়ু হয়েছেন ম্যাকোলে। বৃটিশ শাসনেরও অবসান হয়েছে তিন দশক আগে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে হীনমন্যতা এবং ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারিত্বের বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন ম্যাকোলে, তার ডালপালার বিস্তার এখনও সমানে অব্যাহত। আমরা ক্রমাগত জর্জরিত হয়ে চলছি সেই বিষের সংক্রমণে।

সারা দুনিয়া জুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এই শতাব্দীর প্রথম পর্বে। পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়া খুলে দিচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। শিক্ষাকে কোথাও আর সাধারণ জ্ঞান অর্জনের, অফিস-আদালতের ফাইলের বোঝা টানার কিংবা একটি বিশেষ সুবিধা ভোগী শ্রেণীর আয়ত্তাধীনে রাখা হচ্ছে না। একটা গোটা জাতির প্রগতির, তার অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে। শিক্ষা বলতে এখন ব্যবহারিক শিক্ষাকেই বোঝায়।

একটা জাতির গোটা জনসমষ্টি সর্বজনীন শিক্ষার আওতায় না আসলে সেই জাতির অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নয়, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজ-ব্যবস্থা নির্বিশেষে উন্নত দেশগুলির দিকে চোখ রাখলেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আজকের শিল্পোন্নত প্রতিটি দেশেই শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা প্রায় একশ জন। এসব দেশে নিরক্ষরের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। শিক্ষার সর্বাত্মক বিস্তারের ফলেই এই দেশগুলিতে এত দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সাধিত হয়েছে। জীবনযাত্রার মান এতটা উপরে উঠতে পেরেছে। কলে-কারখানায় এবং ক্ষেতে-খামারে শিক্ষা উৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে শ্রমিক আর কৃষকগণ ব্যবহারিক শিক্ষার পুরোপুরি সুযোগ পাচ্ছেন বলে।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটা মৌলিক পরিবর্তন আসলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোনো ছাপই পড়েনি। বরং, ঔপনিবেশিক যুগের সেই হীনমন্যতা এবং স্থবিরতা ক্রমাগত এর অবয়বকে আরও বেশি আড়ষ্ট করে তুলেছে। আবর্জনার স্তূপের ওপর পুঞ্জীভূত হয়েছে অধিকতর কাদা আর ময়লা। এ ময়লা সম্পূর্ণভাবে সাফ করতে হলে গোটা শিক্ষা কাঠামোর আমূল সংস্কার প্রয়োজন। অতীতে অপাংক্তেয় এ শিক্ষা-কাঠামোর সংস্কারের জন্য বহু দাবী উঠেছে। আন্দোলন হয়েছে। ১৯৬২ সালের প্রচন্ড আন্দোলনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সেই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির মূল বাধাগুলি কোথায়, নিশ্চিতভাবে তিনি তা অবহিত। সেই ব্যাপক আন্দোলনের পরও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নয় বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। শুধু লোক দেখানোভাবে কয়েকটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাবেক আমলেও মূল সমস্যাকে স্পর্শ না করে ভাসাভাসাভাবে শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বাস্তব কোনো সুফল আশা করা যায় না। সুতরাং, ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

একথা সত্য, বহু যুগের স্তূপীকৃত সমস্যায় ভারাক্রান্ত প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর আমূল সংস্কার করতে হলে সময়ের প্রয়োজন। একটি মূল-নীতি প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করতে হবে সংস্কার কর্মসূচীকে।

শিক্ষামন্ত্রী যে-অন্তর্বর্তী শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা বলেছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে আমরা সঠিক এবং বাস্তবসম্মত বলে মনে করি। কেননা এর মাধ্যমে দ্রুত গণমুখী লক্ষ্যসহ শিক্ষার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক লক্ষ্য অর্জিত হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্যে আমরা এই মুহূর্তে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনবোধ করছি সব থেকে বেশি। শিক্ষার এই আশু লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দেশব্যাপী একটি সর্বাত্মক সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশের বাষট্টি হাজার গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে থানা পর্যায়ে কর্মসূচী নেয়া হলে অল্পকালের মধ্যেই এর থেকে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যেতে পারে। গ্রামের প্রাথমিক স্কুল, হাই স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনায়াসে প্রাপ্তবয়স্কদের সান্ধ্যকালীন শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা যায়। শিক্ষাদানের জন্যে সর্বস্তরের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও এই আন্দোলনে রাখতে পারেন সক্রিয় অবদান। বহু যুগ আগে এ ধরনের অভিযান চালিয়েই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করেছে জাপান। শিক্ষার প্রসারের ফলেই জাপানের ঘরে ঘরে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের প্রসার ঘটেছে। সমাজজীবন থেকে দূর হয়েছে বেকারত্ব।

আমাদের অর্থনীতি কৃষির সঙ্গে যুক্ত। আর আমাদের জনগণের শতকরা পঁচানব্বইজনের বাস গ্রামে। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠী আশৈশব কৃষি-জীবনের আবহাওয়ায় লালিত। সুতরাং, এঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আধুনিক কৃষি, কুটিরশিল্প, মাছচাষ, ফলের চাষ হাঁসমুরগী পালন প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার সুফল হবে তাৎক্ষণিক। কেননা, জীবন সংগ্রামে অভিজ্ঞ আর বয়স্ক নরনারী হিসাবে দ্রুত তাঁরা এ ধরনের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবেন। আর এতে অনুপ্রেরণাও বোধ করবেন। অন্য দিকে, সর্বজনীন এই শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠন কার্যক্রমসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথও প্রশস্ত হবে দ্রুত।

এ ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মীর প্রয়োজন হবে। কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে এঁদের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, গ্রামের পরিবেশে কাজ করার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে এই শিক্ষা কর্মীদের। আমাদের বিশ্বাস, সংকল্পবদ্ধ উদ্যোগ নেয়া হলে গ্রামভিত্তিক এই শিক্ষা-কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করা খুব কঠিন হবে না।

প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনবোধ প্রতিফলিত করার প্রয়োজনের কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি সঠিকভাবেই শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যকে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা জাতীয় মর্যাদায় এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। শিক্ষাই হবে আমাদের জনগণের অগ্রগতির এবং দারিদ্র-মোচনের হাতিয়ার। সুতরাং, শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় স্বয়ম্ভরতার, কর্মযোগের এবং অবিভাজ্য জাতীয় সত্তার মূল অনুপ্রেরণায় পরিণত করতে হবে। বিশ্বাস রাখতে চাই, অন্তর্বর্তী শিক্ষানীতিতে এই বস্তুনিষ্ঠ লক্ষ্যগুলিরই প্রতিফলন ঘটবে।

—সানাউল্লাহ নূরী